বি ক ল্প

আবদুর রউফ চৌধুরী

সোমবার। সাতাশে শ্রাবণ।

বর্ষার শেষ।

আকাশ থেকে যত জল ঝরে পড়ার কথা ছিল সবটুকুই হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করেছে। বাদামকালো ছনগুলোও বৃষ্টির জলে ঢলঢল, কয়দিন ধরেই বৃষ্টি চলছে–সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, শুধু বর্ষণ; আবার মাঝেমধ্যে তুফানও–ক্রুদ্ধগর্জনে, বিষাক্তনিশ্বাসে ছোবল মারে ছনের চালে, একইসঙ্গে সাপের মতো বিদ্যুতের দলও নেচে ওঠে মেঘের আড়ালে, বজ্রপাতের মাঝেও শোনা যায় ইস্রাফিলের হুঁঙ্কার, বীণার ঝঙ্কার। মাফিক মনে মনে ভাবে, সারা গ্রামের উপর বোধ হয় অদৃশ্য নিয়তির ক্রুর অভিশাপ পড়েছে; তবুও সে সিদ্ধান্ত নিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেড়ে সে অবাক, শেষপর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি যাবে। মাফিকের মা'রও প্রথম পুত্রবধূ দেখার সাধ অনেক, তাই তিনি ছেলের পাশে বসে তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে শান্তির এক নিশ্বাস ফেললেন। মা'র বুকভরা নানারকম আহ্লাদ, শখ তো বটেই, হাজার স্বপ্নও, শুধু কখনও কখনও ঠোঁট-দুটো দুঃখের ভারে কাঁপছে। তিনি খড়বাঁশের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, মন ও শরীর সামল দিয়ে, মাফিকের স্কুলজীবনের বন্ধু বাহারকে বললেন, 'দ্যাখ বাবা, বউমাকে ফেলে কিন্তু আসবে না।' মাফিক সঙ্গে সঙ্গে তার নির্লিপ্তভাব ভেঙে, মনের কথা গোপন রেখে, বলল, 'তার বাবা না-দিলে বাহারের বয়ে গেছে।' মাফিকের মা আশ্চর্য হলেন না, আশ্চর্য হওয়ার কারণও নেই তবুও হলেন; আর মনে মনে বললেন, মানুষের চাওয়ার মধ্যে কত ভুল থাকে, অস্রহ, তবুও আর্থিক অসুবিধে দূর করা গেল না। তিনি তার সন্তানদের জীবনের প্রয়োজনে নিজের সুখশান্তি ছাড়তে সবসময়ই প্রস্তুত, কিন্তু আজ, কী হওয়ার কথা ছিল আর কি হল; এইমুহূর্তে, মৃদু অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছে তার মনের মধ্যে, তিনি আর তার ত্যাগের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারছেন না, কেউই হয়তো করেও না, তাই নিজেকে দোষী মনে করে অন্তরের ব্যথাকে নিশ্চুপে মাথা নিচু করে খুঁটছেন, জোর করে হৃদয় থেকে না-বলা যন্ত্রণাগুলো উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু পারছেন কই, তাই হয়তো বাহারের দিকে অসহায় মুখে তাকিয়ে বললেন, 'ওর কথায় কান দিস্ না বাবা।' কথাটি বলে বাহারের দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, চোখগুলো কী নিজের অক্ষমতায় ছলছল করছে, না অভিমানে জ্বলজ্বল করছে, বাহার ঠিক বুঝতে পারল না, তাই সে তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিল; তবে সে জানে, জীবনে যা করা উচিত, সবার মঙ্গল যাতে হয় তা সবসময় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও অনেক কিছুই করতে হয়, অন্যায় অবিচারের যন্ত্রণাও মুখ বোজে মেনে নিতে হয়, মনের মধ্যে শত দ্রোহ উদয় হোক না কেন, এই পরিবারের অবস্থা ও অর্থশক্তির পরিমাণ-পরিমাপ বছরের-পর-বছর এই ভাবেই অপরিবর্তন থাকবে হয়তো, যা ভঙ্গণস্তূপের মতো, চারপাশে শুধু ধ্বংসের আবহ। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, শান্তনার স্বরে বলল, 'না চাচিম্মা, ভাববেন না। আপনার বউমাকে কাঁধে করে হলেও নিয়ে আসব, তবুও একা ফিরব না।' বাহারের কথা শেষ হতে-না-হতেই প্রকৃতি আবার মেতে উঠল, বাতাস ঝকঝকে তলোয়ার যেন, সামনে যা পায় কচুকাটা করে, মেঘের সঙ্গে হাতাহাতি-মাতামাতি করতেও ভয় পায় না।

মঙ্গলবার। আটাশে শ্রাবণ।

সকাল

ফজরের পর ধরণী যেন সদ্যস্নাতা বিধবার হাসির মতো করুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠল। সুপুরিগাছের বাবুইবাসাটি যদিও তছনছ, তবুও শাবকের শুশ্রূষায় নতুন উদ্যোগে বাবুইপাখি আবার বাসা বুনতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেদিকে চোখ রেখে মাফিক ট্রাউজার্স পরে, একটি লুঙ্গি ব্যাগে পুরে, মাথাভাঙা ছাতাটি হাতে নেয়, তারপর মা'কে সালাম করে চৌকাঠের অন্যপাশে পা রাখতেই তার মা'র বুকটি যেন হঠাৎ দমাক হাওয়ার ছুবল মারার মতো ধক করে ওঠে। ছেলের মুখে সামান্য চিন্তারেখা দেখা দিলেই তিনি বজ্রপাতের শব্দের মতো চমকে উঠেন, মাফিকের মা জানেন, তার ছেলে নিজের বুকে মুখ গুঁজে পরিবারের চাওয়া-পাওয়ার কথা ভাবে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান কাউকে জানতে দেয় না, একা একা একটু কেঁদে নিজেকে হালকাও করতে পারে না, অন্য কারও, এমনকী বাহারের কাছেও তার ব্যথাবেদনা, লাঞ্ছনাবঞ্চনার কথা বলতে পারে না। তাই তার মনের মাঝখানটি সবসময়ই ফাঁকা থাকে। দিনদিন সেই শূন্যতা বেড়েই চলেছে যেন। তার চারপাশ যেন এক ঘোর লাগা অবাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে কী ঘটছে তা মাফিকের মা যেন বুঝতে পারছেন না, যদিও প্রাণপণ তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন, পারছেন কই, শুধু অভিনয় করে চলেছেন যেন। চৌকাঠ পেরিয়ে-যাওয়া ছেলের মুখ দেখে তিনি ঠিকই টের পাচ্ছেন, ছেলের বুকজুড়ে গোপন-গহন ব্যথা গুমরে বেড়াচ্ছে, তাই বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি নেগাবান, আমার বাপধনকে ছহিসালামতে আমার কাছে ফিরিয়ে এন।' ঈশ্বর যেন তার আহ্বানে একেবারে ছিদ্রওয়ালা ছনের চালের ওপর এসে আসন পেতেছেন। মাফিকের মা শূন্যদৃষ্টিতে বাইরে তাকালেন। কাঁধ থেকে আঁচল কখন যে খসে পড়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। তার কণ্ঠার দুটো হার প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে এত ভাবা কী তার উচিত! ছেলে চলে যাওয়ায় তার ভয় হচ্ছে, ভীষণ একা একা লাগছে, দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত; তবুও তিনি স্তব্ধ হয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, তবে তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে একটি গোপন উত্তেজনায়। একপলকে তিনি দেখতে লাগলেন, দূরে, হাতে ধরা ছাতায় ভর-দেওয়া ছায়াটি ও ছাতাবিহীন প্রতিচ্ছায়াটি এগিয়ে চলেছে। তারা চলেছে বাড়ির সামনে ঘাসজ্বলা একটুকরো জমিন মাড়িয়ে, তারপর কবরের ধসে-পড়া পাঁচিল ঘেরা পাতাবাহারের ঝোঁপ গলিয়ে। হঠাৎ তারা তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। তবে তারা ঠিকই এগিয়ে চলল। তারা চলেছে অর্জুন গাছের নীচ দিয়ে, আলো-ছায়ায় ষোলকটির নকশা আঁকা ঘাস মাড়িয়ে। এগিয়ে চলেছে, পুকুরের পাড় ঘেঁষে একটি কুঠার তার কঠিন হাতে ঝড়ে ভেঙে-পড়া আমগাছটিকে তছনছ করছে, ওলটপালট করছে, তার পাশ দিয়ে। তারা চলেছে ছায়ারেখায় আচ্ছন্ন গ্রামের জানা পথটি ধরে, যদিও গ্রামের বাতাসে একরকম অচেনা ঘ্রাণ বইছে। দুজন পথিক তাদের পাশ কেটে চলে গেল, ওদের গায়ে বর্ষার গন্ধ। ওদের গায়ের গন্ধ শুধু টের পাচ্ছে ছাতাবিহীন প্রতিচ্ছায়টি; কারণ ছাতা ধরে থাকা ছায়াটি ভেবে চলেছে, বাহারকে আমার সঙ্গে আনার দুটো কারণ, প্রথমত: শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশনে আমার শ্বশুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির তিক্ততা তিরোহিত হয়নি আজও, দুজনের মন থেকেই, কাজেই তার উপস্থিতিতে সূচনা সহজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে; দ্বিতীয়ত: যদি উদ্দেশ্য সফল না হয়, তাহলে মা'র দোষারূপ থেকে বাঁচার জন্যে একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন, বিয়ে তো তার উদ্যোগেই সংঘটিত হয়েছিল। মা'র একজন বিত্তশালী বেয়াই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে; তখন দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ চলছে, আর তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন, আমার অমতে পুনরায় তিনি স্বামীগ্রহণ করায় তিনটে মুখ বেড়েছে, 'মুখ দেন যিনি, আহার দেন তিনি'–এরকম কথার তিন-সিকি-ভাগই যে পরীক্ষার অন্তর্গত–তা আমার মা'র আর বোঝার বাকি নেই, কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেল শুধু থেকে যায়

আফসোস, চেনানোর সময়ই ছাগীকে ধরতে হয় অন্যথায় দুর্ভোগ; পূর্বাহ্নে সতর্কতা ও সংযম দারিদ্র্যতাকে দূরে সরিয়ে রাখে, একমাত্র দুর্দশাগ্রস্ত লোকই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

দুপুর

শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশন থেকে মাফিকের শ্বশুরবাড়ি আট মাইল, বেশির ভাগই বাসে, শুধু হবিগঞ্জ সদর থেকে গয়না নৌকায় মাইল খানেক। অন্যমনস্কভাবে বন্ধুসহ মাফিক বাসে উঠল। দুপুরের বাস, যাত্রীর ভিড়। বেশির ভাগই মজুর, কিছু কিছু ব্যবসায়ীও। পথের দু-ধারের ক্লান্ত জীবন হাই তুলে বিশ্রাম নিচ্ছে। দু-একটি খাবারের দোকান থেকে উনুনের ধোঁয়া মাঝেমধ্যে উড়ে এসে যাত্রীদের চোখেমুখে ধাক্কা খাচ্ছে। দুপুরের ক্লান্তিময় রহস্য মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গয়না নৌকা করে বন্ধুসহ শ্বশুরবাড়ির ঘাটে এসে মাফিক নামল। সামনেই তার চির পরিচিত বাংলাঘর, এরই সংলগ্নে, স্বল্পপরিসরে, গোপাটের পূর্বপাড়ে ও খালের পশ্চিমপাড়ে খালি জায়গা খরিদ করে মাফিকের শ্বশুর যে নতুন বাড়িটি তৈরি করেছেন তা দৈর্ঘে প্রস্থে অসমান, আটে-বাইশে, যা পূর্ব-পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন উঠোন ভরাট করার সময় গোপাটটিও ভরাট করে উঠোনের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন মাফিকের শ্বশুর। নতুন বাড়ির পূর্বপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত বাঁশখুঁটির ছোট একটি গোয়ালঘর তৈরি করা হয়েছে, খালের দিকে পিছন ফিরে। তারই দক্ষিণে, খালের পাশ ঘেঁষে, মসজিদে যাতায়াতের জন্য একটি ছোট রাস্তা রাখা হয়েছে; তারই উত্তর পাশে একটু খালি জায়গা আছে যেখানে একটি গোলাপ ও দুটো গন্ধরাজের গাছে ফুটে থাকা ফুলগুলো পাশের গোবরের ঢিপির গন্ধকে প্রশমিত রাখার ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যস্ত। গোয়ালঘরে ছয়টি বলদ ও দুটো গাভী পচা কচুরিপানার উপর দাঁড়িয়ে তাজা কচুরিপানা খাচ্ছে, ছয়টির মধ্যে একটি ভীষণ কালো, বিদেশী হবে, দেহের শক্ত বাঁধনের উপর মস্ত বড়ো এক ঢিবি, আর পরিচ্ছন্ন লম্বা লেজটি মাছি তাড়ানোতে ব্যস্ত, কিন্তু দেশীগুলোর ওপর সচ্ছন্দে মাছির মেলা জমেছে, তাদের সংখ্যা গৃহস্থের সচ্ছলতার পরিচয়। গোয়ালঘরের ঠিক পশ্চিমে হাতলভাঙা টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুয়ে মাফিক বন্ধুকে নিয়ে এগিয়ে এল বাংলাঘরের দিকে, তখন বেলা আড়াইটা।

বিকাল

বাংলাঘরে একটি মেহনতি ছেলে দস্তরখান হাতে নিয়ে হাজির হল। মাফিকের মন অজানা আশঙ্কায় মুষড়ে উঠল, 'স্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাত মুশকিল মালুম হোতা হ্যায়।' চার-বছর মাত্র ছাতুখোরদের সঙ্গে বসবাস করে উর্দুতে ভাবতে শিখেছে মাফিক, একথা ভাবলেই সে অবাক হয়। পাকিস্তানির সঙ্গে সম্পর্ক কোনও দিনই গলাগলির পর্যায়ে পৌঁছোয়নি, অনেক ক্ষেত্রে গালাগালিতেই পর্যবসিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-বাংলার সংযুক্তির সাধ প্রথম মিলনেই মিটে গেছে, ওদের আত্মম্ভরিতার আকস্মিকতায়; তেমনি আজ বিয়ের সাধও মিটে যাবে ম্যাটিনি-শো'র শুরুতেই, এসব ভাবতেই মাফিকের অভিমানী মন ব্যথিত হয়ে উঠল। ছেলেটি বলে যাচ্ছে অনেক কিছু, সেদিকে মাফিকের খেয়াল নেই, তবে ছেলেটি যখন বলল, 'আপনার হউর[১]', তখন তার চমক ভাঙল, ছেলেটি বলে চলল, 'কোঁচ দিয়া মাছ শিকার করাত ওস্তাদ। গতকল্য ইয়া-বড় একটা কাতলা কাবু করছইন। দেখইন কেমন তেলতেলা চেপটা পেটি।' মেহনতি ছেলেটি যখন মাফিকের প্লেটে একটি পেটি তুলে দিতে যাচ্ছে তখন সে খেঁকিয়ে উঠল। ছেলেটি হতভম্ব! পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বাহার বলল, 'আমার

থালায় তুলে দ্যাও।' সে নিশ্চুপে নির্দেশ পালন করল, কোনও কথা বলল না। দস্তরখান গুঁটানো পর্যন্ত সে নিশ্চুপ থাকে, কিন্তু রান্নাঘরে পৌঁছে অপেক্ষারত জায়েদাকে বলল, 'আপা, তোমার সোয়ামির মেজাজ বড় কড়া। খাড়াক্‌খাড়া খারাপ অইয়া[২] যায়। ব্যাপার কিতা[৩]?' উত্তর শোনার আগেই ছেলেটি পানদান নিয়ে দৌড় তুলল বাংলাঘরের দিকে। জায়েদা মনে মনে বলল, শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশনের ঘটনায় আব্বাই বাড়াবাড়ি করেন। তার দোষ কী! চার-বছর পর দেশে এসে মা'র আশীর্বাদ না-নিয়ে স্ত্রীকে দেখতে আসা কী বেমানান নয়! এখন আব্বা বেঁকে বসেছেন। বিয়ের পর মেয়ে কী আর তার বাপের থাকে, সেকথা কী তিনি বুঝেন না! এমন সময় সে তার বাবার কণ্ঠ শুনতে পেল, 'জায়েদা যেন রান্নাঘরের পাঁচিলের বাইরে না যায়।' জায়েদার মা উত্তরে কী বললেন তা শোনা গেল না, তবে জায়েদার অন্তর জপতে লাগল, নানী আসলেই দেখা যাবে তার দামান্দকে দাব দিয়ে বশ মানাতে পারেন কী! জায়েদার বাবার শাসনের সুর মাগরেবের আজানের ধ্বনিও দমাতে পারল না, রয়ে গেল বাদ-মাগরেব পর্যন্ত।

সন্ধ্যা

তখনই তলব এল মাফিক ও বাহার যেন শীঘ্রই ভেতর-বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। মাফিকের শ্বশুর বড়োঘরের প্রধান দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। কদমবুচি, পায়ে ধরে সালাম করে উঠে দাঁড়াতেই উভয়কে তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'বেশ।' মাফিক ও বাহার দুজনই চুপ। তিনি পালঙ্কে পাতা একটি বিছানা দেখিয়ে, মুখে ম্লান হাসি টেনে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, 'বসো।' মাফিকের শ্বশুরের বয়স বেয়ালি-শ, না বায়ান্ন, ঠিক বোঝা যায় না; তবে তিনি একইসঙ্গে দুজন রমণীর রহস্যোদ্ধারে ব্যাপৃত হার-না-মানা মরদ যেন! কামট কুমীর। সুন্নত ধরে রাখার খাঁটি সেবক। চুল ছোট করে ছাঁটা, তাই তার ছোট মাথাকে আরও ছোট দেখাচ্ছে; চেহারা একসময় মোলায়েম ছিল, এখন হতাশাব্যঞ্জক। এরকম চেহারা নিয়ে তিনি হাতল ছাড়া চেয়ারে বসতে-না-বসতেই মাফিকের শালা রশিদ ছোট করে কাটা আনারস ভর্তি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে পালঙ্কের পাশের ছোট টেবিলে রেখে পা ছুঁয়ে সালাম করল উভয়কে; কিন্তু হাসিটুকু তার ঠোঁটের কোণে এসেই মিলিয়ে গেল, স্থির হতে পারল না, ঘরোয়া বৈঠকে বাবার বক্তব্যে তার কিশোর মনে চার-বছর পর দুলাভাইকে দেখার ও পাকিস্তান সম্বন্ধে মজাদার গল্প শোনার কল্পনাচিত্রে ছিদ্র হয়ে গেল, যেন দাদীর ঝাঁপিতে সযত্নে রক্ষিত দাদার বহুকালের দ্রব্যে ইঁদুর পড়েছে; তাই হাসতে গিয়েও তার সারা মুখে ছেঁড়া-দুধের ঘোলাটে রূপ ধারণ করল, তবে পরিবেশ সহজ করতে দুলাভাইয়ের বাঁ-হাতের তিনটে আঙুল নিজের ডান-হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মাফিকের শ্বশুর মাজহারুল শেখ ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের গলায় চার-বছরেও কী একটা চেইন দিতে পারলে না? এ কেমন কথা বাপু?' মাফিক ভাবল, উত্তর দেওয়ার কী-ই-বা আছে! আবার কিছু না-বললে যে বে-আদবী হবে, তাই সে যেভাবে 'টিক' চিহ্ন দিয়ে বিমানবাহিনীর ভর্তিপরীক্ষার পাশ করেছিল ঠিক তেমনি 'জ্বি' বলে উপস্থিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে শেখ সাহেব হেঁকে উঠলেন, 'এখন তো আর কোনও বাহানা থাকতে পারে না।' মাফিক আবারও বলল, 'জ্বি।' এই 'জ্বি' উচ্চারণের সঙ্গে চাঁদের স্নিগ্ধতা নিয়ে উদয় হল শেখের ঝি, মাফিকের স্ত্রী, স্বামীকে উদ্ধার করার জন্যে যেন রহিমা-সীতা। মাফিকের দৃষ্টি তার কপোলদ্বয়ে, রসে টুসটুসে চেরাপুঞ্জির কমলা জোড়া যেন। সামাজিক নিষেধ না-থাকলে যৌবনের দর্পণ যে কপোল তার সৌন্দর্যসুধা পান করে আজ সে পরিপূর্ণ হত এবং বাহু বাড়িয়ে যুবতী-স্ত্রীকে আহ্বান জানাতে পারত। সে অবশ্যি তার স্ত্রীর সৌন্দর্যে নিমগ্ন হতে পারত কোনও কিছু না-ভেবে। বাস্তব কারণেই সেই সৌন্দর্যসুধা পান করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই সৌন্দর্যসুধা আত্মগ্রাস

১. শ্বশুর। ২. ঘয়। ৩. কী।

করার ক্ষমতা থেকে সে বঞ্চিত হল, তাই এই সৌন্দর্যের চারপাশে তার মন শুধু ঘুরপাক খেতে লাগল, তার শ্বশুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনের ক্ষমতা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেললেও, সে অক্ষমই রয়ে গেল। তার মন কেবলই পাগল হতে লাগল, কিন্তু পাগল কী জায়েদার স্বামী হতে পারে? স্বামী কখনও বিকল্প-সত্ত্বা হতে পারে না। হতে পারে না বলেই হয়তো সে ভাবতে লাগল, তার স্ত্রীর গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সৌন্দর্য শুধু চোখে ভালো-লাগার মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণই নয়, হৃদয়ে বাস করা তার ভালোবাসার শক্তিই, যা তাকে খুবই প্রিয়তর করে তুলেছে। একদিকে মাফিকের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে বন্ধনের সন্ধ্যাপ্রদীপের প্রজ্জ্বলিত আহ্বান, আর অন্যদিকে জায়েদার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে তার স্বামীকে দীর্ঘদিন না-পাওয়ার সমস্ত যন্ত্রণার অবসানের আহ্বান এবং সমস্ত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তির পরিতৃপ্তি লাভের বাসনা। হঠাৎ এই পরস্পর জানাজানির মিলনরেখাকে মাজহারুল শেখের দৃষ্টি ছেদ করল। সঙ্গে সঙ্গে মাফিকের আঁখিদ্বয় নত হল। আর জায়েদা পুলকশিহরণ জাগা অন্তর নিয়ে, দীঘির ঢেউ-ভাঙা পদক্ষেপে, তার বাবার কাছে পৌঁছে কদমবুচি করল। তারপর সোজা হয়ে ঘরের এককোণে নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু মায়ের শেখানো সংস্কার তাকে সহজ থাকতে দিল না, আর তখনই শোনা গেল আরেকটি কণ্ঠ, 'মাফিককে সালাম করো।' জায়েদা দেখল রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তার হাস্যময়ী নানী। মুচকি হাসিতে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে এল পালঙ্কের কাছে, আসন পেড়ে বসা স্বামীর পাশে, লাজ নম্র চলনে। মাফিক অনুভব করল পা-স্পর্শ-করা তার স্ত্রীর সুখস্পর্শ; কিন্তু সে এভাবে উপভোগ করতে চায় না, সে চায় তার পায়ে রাখা হাত-দুটো নিজের মুঠোয় রেখে আদর করতে, তাকে পাশে বসিয়ে সোহাগ করতে করতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, কিন্তু তার অন্তরের এই আকুতি পূরণের বাধা যে মাজহারুল শেখ তিনি মূর্তিপ্রতীক হয়ে বসে আছেন সামনে, চেয়ারে। শত পরাবিদ্যায়ও প্রাণসঞ্চার হবে না তার। তিনি তো অপৌরুষের এবং অভ্রান্ত জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে চান না। চান না, দুঃখ-দ্বন্দ্ব-বিরোধ-অজ্ঞান–সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে অমৃতময় মুক্ত জীবনলাভ করতে। তার দেহ-মন-ইন্দ্রিয় সমন্বিত আত্মবুদ্ধি চৈতন্য জ্যোতিতে অপ্রকাশিত। তিনি গূঢ় সত্যকে সহজে উপলব্ধি করতে অক্ষম। আর্তি নিয়ে আর্তের আবেদন মঞ্জুরের প্রার্থিত আঁখিকে উপেক্ষা করে জায়েদার প্রতি বার্তা ঘোষিত হল, 'রান্নাঘরে যাও।' বন্যার রাক্ষুসী থাবা থেকে বেঁচে যাওয়া গৃহস্থের গোলায় তুলে রাখা পরিশ্রমের ফসল যখন মহাজনের পাইক এসে নিয়ে যায়, লগ্নি টাকার চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ গণনা করে সাকুল্য পাওনা হিশেবে, তখন ব্যথাক্ষুব্ধ অসহায় গেরস্থ-বউয়ের অন্তরে যেমনি আলোড়ন সৃষ্টি হয় তেমনি জায়েদার অবস্থা, পিতৃ-আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে অতি কষ্টে সে তার পা-দুটো টেনে নিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে। মেয়ে চলে যাওয়ার পর মূর্তিমান শেখ সাহেব নড়েচড়ে উঠলেন। ফারসী হুঁকোয় একমনে দম নিয়ে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। তারপর ছাদ ছুঁই ছুঁই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যে বলেছিলাম অলঙ্কারের কথা, তা তো এখনই দিতে হয়।' শেখ সাহেবের কথা মাফিকের কানে বজ্রাঘাতের মতো শোনাল; আর বাহারের চোখে শেখ সাহেবের মুখভঙ্গি অসুন্দর হয়ে গেল। বাহার ঝগড়া করতে পছন্দ করে না, খিটিমিটি তার মোটেই আসে না, সে হল জলেভেজা ঠাণ্ডা মেজাজের একজন শান্ত পুরুষ, কিন্তু এইমুহূর্তে কিছু না-বললেই নয়, তাই উত্তর দিল, 'যত শীঘ্র পারে মাফিক সপরিবারে চলে যাবে পাকিস্তানে। সেখানে স্বর্ণ সস্তা। অলঙ্কার তৈরি করে দিতে তার কোনও অসুবিধা হবে না।' বাহারের কথায় ফল হল উলটো। যে ভদ্রলোক তার মেয়েকে হাতছাড়া করতে নারাজ, তিনি কী করে রাজি হবেন তার মেয়েকে সুদূর পাকিস্তানে ছেড়ে দিতে! শেখ সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে জবাব দিলেন, 'না বাবা, আমি এসবে নেই, আমার মেয়ে যেমনি ছিল তেমনি চাই।' হঠাৎ যেন পুকুর থেকে ওঠে আসা উথালপাতাল হাওয়া দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। এই হাওয়া যেন বাহারের মুখে কালো ছায়ার প্রলেপ মেখে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিতে পরিবেশটা অসহ্য হয়ে উঠল। আর শ্বশুরের কথায় মাফিকের

বুকে উথলে উঠল প্রচণ্ড রাগ; যেন সাপ ছোবল মারছে, আর সেখান থেকে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীর জুড়ে। চেয়ারে বসা শেখ সাহেবের মূর্তি ভীষণ জীবন্ত, তবুও মাফিক তার দিকে তাকাতে পারছে না, ঠাস করে একটি চড় বিছানার গায়ে বসিয়ে দিলেও তার শরীর শীলত হবে না। তাই সে নিশ্চুপে সন্ধান করতে লাগল, কী কৌশলে সে তার শ্বশুরের দুমুখী আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। বিছানার গায়ে চড় মারতে পারছে না বলেই হয়তো মাথা নিচু করে মনযোগ সহকারে বিছানায় পাতা চাদরের ভাঁজে ভাঁজে চড়ের সমগোত্রীয় একটি উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পাচ্ছে কই! বাহারও উত্তর খুঁজতে লাগল, তার মন তেতো হয়ে গেছে, শরীরও আপনা থেকে কাঁপছে। সে অবাক! চোখ বুজে ঘনঘন গভীর নিশ্বাস নিতে নিতে তার মাথা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এল, একটু স্বাভাবিক হতেই বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' হুঁকোর নল প্যাঁচোতে প্যাঁচোতে শেখ সাহেব বললেন, 'তালাক ছাড়া দ্বিতীয় পথ আমি দেখছি না।' পরিবেশ আরও কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল, অনেকটা গ্রহণে আক্রান্ত চাঁদের মতো, ঘরের ভেতর জ্বালানো প্রদীপের আলোও দপ করে ম্লান হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে বাহার ভিজে-তেতো গলায় বলল, 'বুঝি না এমন কথা আপনি কেমন করে উচ্চারণ করতে পারলেন?' শেখ সাহেবের বলার ভঙ্গিতে তো অনুমতি ছিল না, ছিল তার সিদ্ধান্ত, তাই দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ পেল যখন তিনি বললেন, 'আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকেই চিন্তা করতে হবে।' ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে জীবনের স্বপ্ন দেখে তেমনি মাফিকের অবস্থা, সে চুপসে যাওয়া ফানুসের মতো মুখ করে বলল, 'এখন উঠি তাহলে।' আতঙ্কিত মাফিক তার শ্বশুরের দেহ পাশ কাটিয়ে প্রাণপণ দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল; আহত মনের এক অসম্ভব প্রচেষ্টা যেন। তবে তার শ্বশুরের মনের দেওয়ালে ফাটল ধরানোর জন্য যে শক্তির দরকার তা তার নেই, কারণ তার মন-আত্মা হাড়িকাঠে ফেলা বলির পাঁঠার মতো ছটফট করছে। তখনই সে শুনতে পেল তার শ্বশুর বলছেন, 'তালাক দিয়ে যেতে হবে কিন্তু।' শেষের শব্দে জোর আরোপ করে বাক্য শেষ করলেন শেখ সাহেব। আকাঙ্ক্ষিত খবরের সন্ধান পেল না মাফিক, যা পেল তা তার কাছে খুবই সাংঘাতিক কথা। উপর থেকে মাফিককে শান্ত দেখালেও তার মনের ভেতর ভীষণ অস্থির ভাব, অসম্ভব অন্যমনস্কের ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে তার চেহারায়, শরীর থেকে তার আত্মা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, নিজেকে খাড়া করে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে; তার কাছে ঘরটা যেন দুলছে। তার শ্বশুরকে মনের এই জটিল অবস্থা বোঝানো যাবে না! নিজেকে ভীষণ একা লাগছে তার। তাই হয়তো সে কপাল কুঁচকে, বিনা বাক্যে, রান্নাঘরের দিকে একবার তাকিয়ে, গাত্রোত্থান করল। বাহারের বুকও মুচড়ে উঠল, খাঁ খাঁ করতে লাগল যেন। রান্নাঘরের গলাগুলোও শব্দহীন। পরিবেশ এমনই উষ্ণ যে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখাই কঠিন, তবুও বাহার শান্ত গলায় বলল, 'এই বিশেষ অর্থবহ শব্দের প্রতি সত্যিকারের একজন শিক্ষিত পুরুষের একান্ত অনীহা আছে বলেই আমি সবিনয়ে অনুরোধ করছি যে, আপনি বিষয়টি আবার ভেবে দেখুন।' তার মুখে কথা আর বেশি এগুতে পারল না। হতাশ হয়ে সে তার বন্ধুর গমণপথ অনুসরণ করল। শেখ সাহেব নিশ্চুপভাবে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

রাত

খাবার যথানিয়মে বাংলাঘরে পরিবেশন করা হল। একসময় শেষও হল। তারপর দুই বন্ধু পরামর্শে বসল, তবুও তারা সমস্যার সমাধান করতে পারল না। সময় যেন ঝড়ের মতো এগিয়ে যেতে লাগল। রাত এগুতে লাগল। একসময় বাহার ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের ঘনীভূত অন্ধকারে, ঘরের কোণে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে মাফিকের মনে রচনা করে চলল, নানা কল্পনা, ঈশাণ কোণে জমে ওঠা মেঘের মতোই গভীর। কল্পনাগুলো

গভীর অন্ধকারে অর্ধদৃষ্টিতে নয়, উর্ধ্ব-দৃষ্টিতেই মুখ তুলে ভিড় জমাচ্ছে তার অন্তরে, মাথায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই যেন চঞ্চল তার কল্পনা। তার মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গেছে, বরং সেখানে শুরু হয়েছে অন্ধকার-ঘরে জেগে-ওঠা ক্ষুদার্থ শিশুর কাতর কান্না; বিদ্যুদ্বেগে এই কান্না যেন তার সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে। এখানে আসার পর একটি সুখবরের জন্য সে প্রতীক্ষায় ছিল, কিন্তু এখন ভাবছে, ফয়সালা না-করে পালিয়ে যাওয়াই উচিত, এমনকী ধামাচাপা দিয়ে সরে পড়াই উত্তম। কিন্তু না, সে মনে মনে বলল, এসব আমার পক্ষে অসম্ভব, স্ত্রীকে উদ্ধার না করে, গা থেকে দ্বায়িত্ব ঝেড়ে, নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়াতে আত্মতৃপ্তি থাকে না, বরং আমার পৌরুষে বাঁধে। স্ত্রী যদি সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে তাকে রেখে যাওয়া কাপুরুষতা নয় কী! যদি যেতেই হয় তবে তার বর্তমান মন-মানসিকতা একবার জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য গত চার-বছরের পত্রালাপে আমি বুঝতে পেরেছি জায়েদা পিতৃতন্ত্রে পরিচালিত মানুষ নয়। ব্যক্তি-মানবীয় চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ একটি সজীব প্রাণী সে। জায়েদা তো চায় তার স্বামীর সঙ্গে, শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে বসবাস করে মানুষের মতো বাঁচতে। বর্তমান যুগের স্ত্রী তো পারে না মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে তার বাবার বাড়িতে ক্রীতদাসীর মতো নিষ্ঠুর জীবন কাটাতে, সে তো মুক্ত প্রয়াসিনী। তার পক্ষে তার পিতার নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব। তার পিতৃগৃহ হয়তো তার কাছে আর্দ্র অন্ধকারের গোহর, তার পিতার নিষ্ঠুর গোহা–এত তার জন্য অমাবস্যার গহীন অন্ধকার–গুমরে-ওঠা এক বুকফাটা শ্বাস। তবুও স্বামীর ভালোবাসার জন্যে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথা সহ্য করা কী তার পক্ষে সহজ ব্যাপার! তাই ওকে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন, যেন যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু সে সময় কোথায়? বিহ্বল, বিমূঢ় মাফিক অনেক রাত পর্যন্ত নিদ্রিত বাহারের পাশে শুয়ে শুয়ে এসব ভেবে চলল। কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা আর নিষ্ফল স্বপ্নের মধ্যে বন্দী এক প্রাণীর অসহায় অবস্থা যেন। তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে অহরহ অকথিত ব্যথা। সে শুয়ে শুয়ে, তার ডান-হাতের দৃঢ়বদ্ধ মুঠোতে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে, তার উজ্জ্বল ললাটে যেন রক্ত জমে উঠেছে, তার অন্তর যেন তীব্র আঘাতে হাহা করে উঠছে, তার আত্মা কখনও কখনও ফেটে পড়ছে ফুলে-ওঠা কান্নায়, কিন্তু মুক্ত বাতায়ন দিয়ে মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে, সেই অজানা ব্যথাটি শিরশির করে উঠছে তার বুক জুড়ে। সে নিজেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ভেঙে ফেলে দিতে চাচ্ছে এই রুদ্ধঘরে। ঘরের পরিবেশে এক প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে অন্ধকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রেমময়ী মানবীকে না-দেখে, না-ভেবে স্বৈরাচারী স্বামীর মতো তালাক নামীয় অস্ত্র দিয়ে অন্ধকারে আঘাত করা হয়তো তেমন কঠিন কিছুই না, কিন্তু তা আমার পক্ষে অসম্ভব। ভালোবাসার দাবী নিয়ে, সমান অধিকারে, আমরা পরস্পর মিলিত হয়েছি। এমতাবস্থায় কোন ক্ষমতার বলে আমার স্ত্রীর অধিকারকে হত্যা করবো? সত্যি খুন-খুনের বাড়া। কথায় বলে আল্লাহর ঘর মসজিদ তোড়ো, তবু মানব মন তোড়ো না। একতরফা সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অন্যায়। ওর মতাভিমত জেনে নিতে হবে, নির্ভুল ভাবে। ওকে বুঝতে যেন আমি ভুল না করি। এই পরীক্ষানিরীক্ষার পন্থাপদ্ধতি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতে একসময় মাফিক ঘুমিয়ে পড়ল।

বুধবার। ঊনত্রিশে শ্রাবণ।

সকাল

মায়াজ্জিনের কণ্ঠে উচ্চারিত ফজরের আজানের শিরিণ-ধ্বনি মাইকের মাধ্যমে ডাকাত-পড়া পাড়ার পাহারাদারের চিৎকারের মতো মাফিকের কানে আঘাত হানলেও তার ঘুম ভাঙাল না, বরং দেরিতেই, জলভাঙার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে, তার চোখ খুলল। ঘুম ভাঙার পর, বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখল, শ্বশুরের রোজগারি ডিঙিনৌকার সাহায্যে হাওর থেকে কচুরিপানা এনে দেশী গরুগুলোর সামনে রাখছে। একপাশে দাঁড়ানো বিদেশী বলদের কালো চোখ-দুটোতে হিংসের আগুন যেন, ওর স্বভাব দেখেই মনে হচ্ছে শান্তশিষ্ট বা ভদ্রমেজাজের সে নয়, তার বিশাল ঘাড় ফুলে উঠেছে। সে লেজ উঁচিয়ে, শিং-দুটো দুলিয়ে ক্রুদ্ধগর্জনে তাকাচ্ছে রোজগারির দিকে। রোজগারি ওর চোখে কী দেখল সে-ই জানে, তবে সে তাড়াতাড়ি কিছু কচুরিপানা তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে বড়োঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। হাফহাতা শার্ট গায়ে জড়িয়ে, রোজগারিকে পাশ কাটিয়ে মাফিক হাতমুখ ধুয়ে, ঘরে ফিরতে-না-ফিরতেই নাশতা এসে হাজির হল। তার মনে হল, একজন তাকে চোখে চোখে রাখছে, যা অবশ্যই আনন্দদায়ক অনুভূতি, বাদ্যযন্ত্রের কোমল সুর যেন। নাশতার রকমারি লক্ষ্য করে সে মুগ্ধ হল; আর এসবে নানী-নাতনীর যত্নস্পর্শ কল্পনা করেই তার অন্তর পুলকিত হল। নাশতার মধ্যেই যেন মিশে আছে তার স্ত্রীর সৌন্দর্য-সুধা। তার স্ত্রীর আপাতসৌন্দর্যের পিছনে যে আর এক অপার গভীর-উদার-মার্জিত যত্নের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা সে এর আগে কখনও অনুভব করেনি। এমন সুখময় সময়ে 'হ্যাল' বলে কামরায় ঢুকল মাফিকের আরেক বন্ধু, যার সঙ্গে বাহারে কোনও পরিচয় নেই। বাহারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মাফিক বলল, 'আবদুল মৌলা। আমি যেমন তোমার স্কুল-জীবনের বন্ধু তেমনি সেও আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু।'

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে, বাহারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার পাশে বসতে বসতে মৌলা বলল, 'আসলে আমার নাম আবদ্-আল-মাওলা[৪]।'

মাফিক স্মিত মুখে, মৃদু ধমকের সুরে, বলল, 'এতদিন ধরে জেনে এসেছি তোমার নাম আবদুল মৌলা। এখন তা কেমন করে আবদ-আল-মাওলা হয়ে গেল?'

মৌলার ঠোঁটে লিকলিক করছে ফিচিক হাসি। এই হাসি ঠোঁটে ধারণ করে সে উত্তর দিল, 'আমরা 'আল' শব্দাংশকে ভুল করে আবদ্ (গোলাম) শব্দের সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম। আসলে যুক্ত হবে মাওলা (আল্লাহ) শব্দের সঙ্গে। যেমন আল-কুরআন।'

মাফিক বলল, 'আজ কোন কারণে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল কে জানে।' তারপর যোগ করল, 'তাই বলে কী কামসূত্রকে আল-কামসূত্র বলতে হবে!'

মৌলা বলল, 'বেকুবের হাঁড়ি! সম্মানসূচক শব্দের সঙ্গে 'আল' যুক্ত হবে, 'গোলাম'-এর সঙ্গে নয়। আমাদের বিদ্যার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত তাই আমরা লিখে থাকি আব্দুল করিম, কিন্তু হওয়া উচিত আবদ্-আল-করীম৪।

বাহার প্রশ্ন করল, 'শতাধিক বছর ধরে আমাদের নামের এমনি ভুল ব্যাখা করার মূলে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা ২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

মৌলা বলল, 'শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দু-সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিতদের আরবি ভাষায় অনীহা ও অজ্ঞতাই এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য মুসলিম-সম্প্রদায়ের শিক্ষাসহ সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদতার জন্যে মূলত নিজেরাই দায়ী, যার ফলে আজও দেখা যায় ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে উঠছে মৌলবাদী ধ্যানধারণা, যা নতুন প্রজন্মকে প্রভাবান্বিত করছে, যাতে আমাদের কূপমণ্ডূকতা চিরস্থায়ী হয়।'

কী যেন জবাব দিতে বাহার হাঁ করল, কিন্তু এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন শেখ সাহেব, সঙ্গে একজন আলখাল্লাধারী মৌলভী; বাহারের চোয়াল বন্ধ করা আর হল না। শেখ সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'হুজুরে আলা, পীরে কামেল, মোজাদ্দীদে যামানা...।'

শেখ সাহেবের মুখ দিয়ে কথার বগবগ ফেনা উথলে ওঠার আগেই আলখাল্লাধারী মৌলভী ফরমালেন, 'অতসব বলিতে নাহি।'

শেখ সাহেব বিনয়াবনতভাবে বললেন, 'আপনার সিফাৎ কী বলে শেষ করা যায়! সামান্য উল্লেখ করতে হয় তাই করলাম।'

বড়োঘর থেকে একটি বড়োচেয়ার এনে, ঝারমুছ করে, বসতে দেওয়া হল পীর সাহেবকে; আর শেখ সাহেব হযরত মৌলানার খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্তসমস্তভাবে বড়োঘরের দিকে ত্রস্তপদে উধাও হয়ে গেলেন। পীরে কামেলের এভাবে উপস্থিত হওয়ার কারণে মাফিকের স্বাভাবিক হাসিটুকু উবে গেল, নিজেকে খুবই একা, মৃত্যুহিম, আসহায় লাগছে। বন্ধুদের মুখও সময়োচিত গম্ভীর। পীর সাহেব বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি-হে জায়েদার সুয়ামি?'

পীর সাহেবের মুখের গাম্ভীর্যতা যতই কৃত্রিম হোক না কেন, বাস্তবিকভাবেই তাকে সহ্য হচ্ছে না মাফিকের, তাই বলল, 'আপনি আমার বন্ধু নন, আবার আমি আপনার শালার পোলাও নই, তাই বলি–আপনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার অধিকার কোথায় পেলেন?'

'জায়েদার বাপ আমারই শাগরেদ।'

'এতে আমার উপর আপনার অধিকার বর্তায় না। জায়েদার উপরও না।'

'ঠিক আছে, মানিয়া লইলাম। না-মানিয়া উপায়ই-বা কী? যুবাদলকে আজকাল উত্তপ্ত করা উচিত নহে, সন্ত্রাসে ভরিয়া গিয়াছে দেশ।'

'রগকাটা তো আপনাদের একমাত্র পেশা।'

'যে কাজের দায়িত্ব নিয়া আসিয়াছি, তার বাহিরে অন্য বিষয়ে তর্ক করিতে আমি রাজি নহি।'

'ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম।'

'একথা কি সত্যি নহে, দীর্ঘ চারিটি বছর জায়েদার সংবাদ নেওয়া হয় না-হি।'

'না, একথা সত্য নয়।'

'মিথ্যাও নহে বটে। স্ত্রী দীর্ঘ সময় স্বামী ছাড়া একা একা বাস করিলে বিনা কারণেই তালাক হইয়া যায়।'

‘তাই না কী?’

মাফিককে উদ্দেশ্যে করে বাহার বলল, ‘মাওলানার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কিছু বলতে দাও।’

‘না, মৌলা ও তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। পীরসাহেবের মতো একজন কূপমণ্ডুক আলেমের রহস্যভাণ্ডার জন্যে আমি একাই যথেষ্ট।’ তারপর ঘন দাড়ি-ঘেরা নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে মাফিক যোগ করল, ‘যদি তা হত তবে তকলিফ করে আপনার এখানে আসার প্রয়োজন কী?’

দাড়ি খিলাল করতে করতে আলখাল্লাধারী মৌলভী জবাব দিলেন, ‘স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে মোহরানা পরিশোধ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে পাক-কুরআনে। সূরায়ে নিসায় বর্ণিত মোহারানা পরিশোধ করিবার তাৎপর্যতা বুঝাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি।’

‘আপনারা যদি বুঝতে পারতেন কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী, তাহলে মুসলিম সমাজের এত অধঃপতন হত না।’

‘আপনি কিহি বলিতে চাহিতেছেন?’ রাগত স্বরে প্রশ্ন করলেন মৌ-লোভী।

ডান হাঁটু সোজা রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে, মাফিক উত্তর দিল, ‘আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পীর-পরস্ত্রীপ্রচারকারী-আলেমের পক্ষে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। অন্যথায় আপনি অবশ্যই জানতেন সূরা নিসায় একথাও আছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেলে মোহরানা কেন, কোনও ব্যাপারেই আপনি বা মেয়ের বাবা কিছু বলতে পারেন না। তবু যদি কিছু বলতে চান তাহলে তা হবে অনধিকার চর্চা।’

মাফিকের তীক্ষ্ণধার কটাক্ষ গায়ে না-মেখে সহজভাবে জবাব দিলেন পীর, ‘এই সমঝোতা তো আপনাদের মাধ্যে হয় নাহি।’

‘কী করে জানলেন?’

‘স্ত্রীর সহিত আপনার মিলন ঘটিয়াছিল কি করিয়া? আপনি তো চার-বছর বিদেশেই ছিলেন!’

‘আমাদের অন্তরের মিলন নিশ্চয় আছে। তবে আপনি যে মিলনের কথা বলছেন তা অবশ্য ঘটেনি। আর তাছাড়া তার সঙ্গে যে আমার বোঝা-পড়া হয়নি তা জানেন কি করে? হয়েছে বলেই তো তার প্রতি আমার মমত্ববোধ, আন্তরিক ভালোবাসা প্রচুর। আর এসব আমার স্ত্রী উপলব্ধি করে বলেই তো সে আমার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান। প্রিয়তম রূপে আমাকে গ্রহণ করতে তার অন্তরাত্মা সবসময়ই উন্মুক্ত।’

‘চার-বছর স্বামী ছাড়া বসবাস করিলে তা তালাক সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে বিখ্যাত কাজকান কিতাব।’

‘জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিত, কিন্তু বোকার জন্য ধাক্কা।’

মৌলার এরকম স্বগতোক্তিতে সাড়া না-দিয়ে মাফিক বলল, ‘যে কথাটি আমি বলতে চাইনি, তা-ই বলতে বাধ্য করছেন, তাই না!’

আলেম সাহেবের সুর নরম হয়ে এল। পান-পাতায় ডান-হাতের দুটো আঙুলের স্পর্শে চুন মাখতে মাখতে উপদেশের ভঙ্গিতে বললেন, ‘আপনার শ্বশুরের সংশয় দূর করিবার চেষ্টা আপনি করুন। কারণ, কোন-হ

মাইয়ার পিতা চাহিবে না শাদির সঙ্গে সঙ্গে জামাই নিরুদ্দেশ হইয়া যাউক; একেবারে চার-চারটি বছরের জন্য।'

'তখন সে-যে নাবালিকা ছিল সে-হিশেব কী তার মা-বাবা রাখেননি! অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বিয়ে দেওয়া অনুচিত নয় কী! দিলে তো ধর্ষণের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়। তাই না! যে-যুবক সে-সুযোগ গ্রহণ করল না, তাকে প্রশংসা করবেন, না তার কিশোরী স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে শাস্তি দেবেন? একবার তাকে জিজ্ঞেস করবেন না, এ-ব্যাপারে তার অভিমত কি? জানতে চাইবেন না, আপনার ওকালতি তার আদৌ প্রয়োজন আছে কী না! মেয়ে বলে তাকে উপেক্ষা করবেন কী শুধু!'

মাফিকের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি না-করেই কাঁধে জিন-ভর-করা পীরের মতো হুজুরে আলা ফরমালেন, 'আপনার সহিত তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিব না। শুধু জানাইয়া দিতেছি সসম্মানে তালাক না-দিলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।'

স্প্রীংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠল মৌলা, বলল, 'আমার বন্ধুকে সস্ত্রীক তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা কী আমাদের নেই?'

'আমি লাঠালাঠি চাই না, তবে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, তালাক দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'অত আস্পর্ধা?'

'রাগ করবেন না হুজুরে-আলা।' মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল বাহার। মৌলা যোগ করল, 'সত্যি কথা তেতোই হয়।'

হুজুরের উচ্চঃস্বরের কথা শুনে মাফিকের শ্বশুর ত্রস্তে এসে বক্তব্য না-বুঝেই হুমকি দিলেন, 'তালাক নিয়ে তবে ছাড়ব।' তিনি যেমনি এসেছিলেন তেমনি আবার ঝড়ের বেগে ফিরে গেলেন বড়োঘরের বারান্দায়। তবে বাংলাঘরের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে রইল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শ্রাবণ শেষের ভ্যাপসা গরমে এমনিতেই অসহ্য লাগে। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা এল না। ঘরের পরিবেশ ভারী নিঝুম। যেকোনও সময়ে বোমা বিস্ফোরণের মতো নীরবতা ভেঙে যেতে পারে, একসময় ভাঙলও, মাফিক আলখাল্লাওলাকে বলল, 'তালাক দিতে হলেও স্ত্রীর উপস্থিতি প্রয়োজন। শরিয়ত সম্মত কথা। তাই আমি প্রস্তাব করি আপনাদের সাক্ষাতে আমার প্রশ্নের উত্তরে জায়েদা যে অভিলাষ ব্যক্ত করবে সে মোতাবেক আমরা চলবো। কি বলেন?' পীরের অন্তর যেন পাথর, তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না, তবে দীর্ঘ দাড়ি দুলিয়ে, সাপুড়ে ওঝার মতো ফতোয়া ঝাড়লেন, 'অর্বাচীন মাইয়ার কথায় মুরব্বীয়ান চলিবেন? কি যে বলিতেছেন!'

'শিশু জন্মদানের সিদ্ধান্ত যে নিতে পারে, সে কেন পারবে না তার ভবিষ্যতের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতে? মানুষ তৈরির কারখানার প্রধান মিস্ত্রিকে অবজ্ঞা? অজ্ঞতার অজুহাতে অপরাধ ঘুচে না।' মৌলার কথাগুলো জ্বলন্ত সীসাখণ্ডের মতো আলখাল্লাওলার কর্ণে প্রবেশ করতেই তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। দৃষ্টিভ্রম ঘটল। মৌলা প্রতিভাষিত কণ্ঠে পীরকে 'মালাউন' বলতেও দ্বিধা করল না। পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনে শঙ্কিত বাহার ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'এ-প্রসঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।' আলখাল্লাওলাকে শান্ত করার সদিচ্ছা তার কণ্ঠে পরিস্ফুটিত, 'দুটো মানুষ একত্র বাস করলেই মনোমালিন্যের প্রশ্ন আসে। তখন হয়তো পরিস্থিতি চরমে পৌঁছার আশঙ্কা থাকে। আর সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই তখন পৃথক হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই বলি

হুজুরে আলা, মাফিক ও জায়েদাকে একত্র বাসের সুযোগ করে দিন। তারপর অলঙ্কার নিয়েই হোক বা ভালো লাগা, না-লাগা নিয়েই হোক–যেকোনও কারণে বিরোধ ঘটলে আপনি তালাকের ফতোয়া দিতে পারবেন। একদফায় তিন-তালাক, না তিনদফায় তিন-মাসে তিন-তালাক দিতে হবে–এসবের ফয়সালা তখন আপনাকেই করতে হবে। তবে বিরোধের আগেই যদি আল্লাহর অপছন্দকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর রোষে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। আপনি আমার মুরব্বীর মুর্শিদ। আশাকরি আপনার মুরীদের মেয়ের স্বামীসহবত সুখীসুন্দর জীবন করতে সরলপথ দেখিয়ে দিলে আপনাকে খুশি করতে তার কসুর হবে না। আমরা সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে সচেষ্ট হবো আপনার খেদমতে।' বাহারের কথায় যেন অমীমাংসিত রহস্যের গ্রন্থিমোচন ঘটল, তার ইঙ্গিত টের পেয়েই বোধ হয় তিনি উচ্চারণ করলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ।' পরক্ষণে যোগ করলেন, 'দেখিতেছি কি-হে-কি করিতে পারি।'

বুজুর্গানে দ্বীনের বেশে ফক্কর-দালাল নতুন ধান্দার ফন্দিফিকিরে ব্যস্ত হতে গোপাটের অপর-পাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধুতে পরামর্শ শুরু হল। সিদ্ধান্ত নিল। ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। বিলম্বে হলেও কার্যসিদ্ধি হবে; কারণ, তাদের দাম্পত্যজীবন প্রেমময়। সকলই জানে নিদান-নৈরাশ্যে প্রেমই শান্তির প্রলেপ পড়িয়ে দেয়, এ প্রমাণ্য সত্য, সঠিক প্রয়োগে প্রেম সর্বজয়ী হয়ই।

মৌলা বলল, 'দেখ মাফিক, তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে একটি উপহার প্রত্যাশা করা পীরের জন্য অন্যায় কিছু নয়।' একথা বলে সে হাসল, অর্থবহ হাসি। তারপর স্বভাবসুন্দর ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, 'মোল্লা ব্যাটা বুঝতে পেরেছে যে তুমি এখানে অসহায় নয়। তোমার দল যথেষ্ট ভারী। এখানে তার জারিজুরি অচল। গত বর্ষায় তোমার চাচা-শ্বশুর, এই মোল্লার প্ররোচনায়, তার মেয়ের জামাইর কাছ থেকে জোর করে মধ্য-হাওরে, নৌকায় বসে-থাকা অবস্থায়ই, তালাক আদায় করেছিলেন। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব নয়। তোমার শ্বশুর সাহেবের মালুম হয়ে গেছে আমার উপস্থিতিতে। যেকোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা সদলবলে প্রস্তুত। যাক্‌গে, এখন চলো ব্রীজ খেলে মনকে হালকা করি।'

বাহার বলল, 'খাবারের কী হবে যদি তারা বেঁকে বসেন।'

মৌলা স্মিত মুখে বলল, 'সেজন্যে মোটেই ভাবতে হবে না।' তারপর যোগ করল, 'পুবের বাড়ি থেকে না-আসে তো আসবে পশ্চিম থেকে। বাকি রইল দক্ষিণ, উত্তর। সর্বোপরি, আমি মনে করি যে, নাতনী-নানীর মিলিত তৎপরতা চলছে আমাদের পক্ষে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। ফল প্রকাশ শুধু সময় সাপেক্ষ।' মৌলার কথা সমর্থন করে মাফিক বলল, 'কদমবুচির সময় আমার পায়ে হাত দিয়ে যে সংকেত দিয়ে গেছে তাতে তার আন্তরিকতা, আকর্ষণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।' তারপর কী যেন কী চিন্তা করে যোগ করল, 'তবে বাংলার মেয়ে অবলা, তদুপরি লজ্জাবতী লতা যেন।'

দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা-রাত

সময় এগিয়ে চলল। যোহর-আছর-মাগরিব-এশা। তারপর রাত। গভীর রাত। জানালায় মৃদুমন্দ শব্দ উঠতেই মাফিক তড়িৎবেগে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; এরকম শব্দের জন্যই সে যেন অপেক্ষায় ছিল। পাশের বাড়ির কুকুরের ঘেউ ঘেউ থেমে গেছে অনেক আগেই, প্রতিপক্ষ ছাড়া একতরফা চিৎকার কাঁহাতক করা যায়! বালিশের নীচে খোলে রাখা হাতঘড়ি দেখলেই সময়ের হদিশ পাওয়া যেত, বোঝা যেত রাত কত হয়েছে, কিন্তু

সময়ের গতি জানার তার কী গরজ! থেমে যাক না সময়, সবকিছু, গতি হোক শুধু এই মৃদুমন্দ শব্দের; শব্দটি যাক-না বয়ে তার শিরা-উপশিরা দিয়ে, প্রিয় মিলনের উন্মেষে। মাফিক ভাবের এই তন্ময়ভাব ত্যাগ করে, একটি শার্ট গায়ে জড়িয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল তারাভরা চাঁদহীন আকাশের নীচে। তার দৃষ্টির সীমানায় অন্যকিছু নেই, শুধু আমগাছের ছায়ায় একটি কিশোরীর হাত ধরে একজন বৃদ্ধার দাঁড়িয়ে থাকার চিত্রটি। নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই বৃদ্ধা বললেন, 'এ নাও তোমার ধন, রেখেছিলাম সংগোপনে।' নাতনীর লজ্জাবনত থুতনিতে নাড়া দিয়ে, তাকে এগিয়ে দিয়ে তিনি হারিয়ে গেলেন ছায়াঢাকা আমতলা থেকে। এক অদ্ভুত নেশায়, মাদকতায় আমতলা ভরপুর; কিন্তু ভয়হীন জায়েদা এগিয়ে এল তার স্বামীর কাছে। মাফিক তাকাল তার স্ত্রীর চোখে, উল্লাসচঞ্চলস্নিগ্ধতায় ভরপুর চোখ-দুটো যেন। জীবনের গভীরতাও। প্রেম ও করুণাও খেলে বেড়াচ্ছে। মাফিক রহস্যময় আবেশে হারিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চেতনা দিয়েও যেন সে তার স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারছে না। অবুঝ প্রেম যেন স্নিগ্ধতায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাফিক হাত বাড়িয়ে দিল। স্বামীর ঈপ্সিত স্পর্শে চিকচিক করে উঠল জায়েদার কালো চুল। গোলাপের মতো ঠোঁট-দুটোও আনন্দে কাঁপছে। সুউচ্চ কবরী ধীরেস্থিরে নেমে এল মাফিকের প্রশস্ত কাঁধে–স্বচ্ছন্দে, সানন্দে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে। জায়েদার উরসে উত্থিত ব্যথা-তাড়ন-মন্থন থামিয়ে দেওয়ার জন্যে মাফিক নিজের প্রশস্ত বুকে তাকে ধারণ করল; এতে কোনও কাপুরুষতা নেই, লজ্জাও নেই; আছে শুধু দৃঢ় বাহুবন্ধন। এতে সগর্বে ঘোষিত হল নিবিড়-নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, স্বস্তি, প্রেম–নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নির্ভরতা ও শুভ চিন্তা। জায়েদার অশ্রুবান বন্ধ করার জন্যে তার আঁখিপাতে দীর্ঘ চুমু খেল মাফিক; গভীর, সঞ্চিত সোহাগে। সোহাগের জোরেই তো মানুষের পরমায়ু বেড়ে যায়। আনন্দতৃপ্তিতে জায়েদার আঁখিপাতা বুঁজে এল, তবে মুখ ঝলমল করছে। সে তার বাহুলতা দিয়ে মাফিককে জড়িয়ে গলাবন্ধ হয়ে রইল। বাঁধভাঙা আবেগ বয়ে চলল তড়িৎবেগে সর্বাঙ্গে। কতক্ষণ? দুজনের কেউই জানে না। প্রকৃতি পুলকিত। লক্ষ্মী পেঁচা ডেকে উঠল, অদূরে। দূর আকাশে তারাগুলো শুধুই হাসছে। আবেগানন্দে স্পন্দিত অধর অধরের সঙ্গে বন্দী।

হঠাৎ গদগদ কণ্ঠে অভিমানিনী বলল, 'তুমি নাকি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছো?'

'তা চেয়েছিলাম তালাক না-দেওয়ার জন্য।'

'এই শব্দটি আর কখনও উচ্চারণ করবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে!'

'তোমার সঙ্গে যাব না তো যাব আর কার সঙ্গে?'

'চলো।'

'এক্ষুণি?'

'এই মুহূর্তে? এমনি বেশে? রাজি?'

জায়েদার চোখের সামনে অনেক অন্যায় হয়ে গেছে, মুখ খুলে কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি, কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে চাচ্ছে না, তবুও মুখ ফুটে কিচ্ছুই বলতে পারছে না, শুধু মাফিকের বুকে তার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবছে, ঠিক পারব তো অতল অন্ধকার পাড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে নতুন করে বাঁচতে!